পরানবন্দি

লেখক
ডা. শামসুল আরেফীন

সম্পাদনা
আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

তোড়জোড় | ৫
ভালোবাসার রাস্তা | ১৪
দরবারে ইশক | ২১
পরানের কথা | ৩৩
জান্নাতের বাগান | ৪৪
জান্নাতুল বাকী | ৫২
জান্নাতুল বাকী (বর্তমানে) | ৫৫
মদীনা, সোনার মদীনা | ৬১
পূর্ণবৃত্ত মানে নবিযুগের মসজিদ | ৬৭
অপূর্ণ মানে পরবর্তী কালের মসজিদ | ৬৭
বিদায় প্রিয়তম | ৭৬
ইহরাম | ৮০
উমরা | ৮৬
তুমি আর আমি | ৯৫
মক্কা যিয়ারত | ১০০
আবার উমরা | ১১৮
কী জানি | ১২৫

তোড়জোড়

ইমিগ্রেশন পার হবার পরগে' শান্তর মনটা একটু শান্ত হলো। এক লহমায় উবে গেল বাসা-থেকে-টেনে-আনা জমাট উদ্বিগ্নতাটুকু। মাথা ভারী ভারী ভাবটা। সিদ্ধান্তটা খুব দ্রুতই নেয়া হয়ে গেছে আসলে। যেদিন ঠিক হয়েছে ওরা যাবে, তার ঠিক ১৪ দিনের মাথায় কীভাবে কীভাবে ভিসা-টিকিট সব কমপ্লিট। ঠিক ১৪ দিন আগেও ওরা কল্পনা করেনি। ঘুণাক্ষরেও না।

এর মাঝে দুয়েকজন বেরসিক আদমি শান্তর কানে ঢেলেছে : ইমিগ্রেশনে নাকি পুলিশেরা কী কী সব জিগ্যেস-টিগ্যেস করে, হেনস্থা করে। যেন রাক্ষসপুরী। দৈত্যদানো বসে-টসে থাকে। এমনিতে বেচারা আগে কখনও বিদেশ যায়টায়নি। এই পয়লা বার ঘর ছেড়ে বেরোচ্ছে। তাই সকাল থেকেই বুক দুরুদুরু। ফেরতই পাঠিয়ে দেয় কি না ইমিগ্রেশন থেকে। এতোগুলো টাকা তাহলে বিলকুল জলে। জলে গেলে তাও তুলে শুকোনো যায়। একেবারে জলে গুলে নাই হয়ে যাবে। যাক বাপু, যা যা ভেবে ডরাচ্ছিল, তার ছিটেফোঁটাও নেই সেখানে। ইমিগ্রেশন পেরোতেই...আহ শান্তি। ঠেকছে যেন ওজনই কমে গেল আধা-সের। তাহলে আসলেই আমি যাচ্ছি? আমরা যাচ্ছি ওখানে সত্যিই?

এখনও বিশ্বাস হতে চাইছে না শান্তর। এই দ্বিতীয় দফা শান্তর মনে হচ্ছে, স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝে টানাপোড়েনের আসলেই একটা জায়গা আছে। যেখানে মানুষ আউলে যায়। বিশ্বাস-অবিশ্বাসে হাবুডুবু খায়। যেখানে বাস্তবতা ফিকে ফিকে। প্রথম বার ছিলো বছর দশেক আগে। এমনই এক ঘুমের ঘোর ভেঙে শান্ত ধুম মেরে বসে ছিল। কনফিউজড এবং ফিউজড। এইমাত্র যা ঘটল, তা বাস্তব ছিলো না তাহলে? অনুভূতিটা এতো প্রাণময়! যেন আসলেই ঘটলো এইমাত্র ওর সাথে।

অন্ধকারে পাগলের মতন দৌড়ে বেড়াচ্ছে শান্ত। অন্ধকারে আমরা নর্মালি এভাবে দৌড়াই না। হাতড়ে হাতড়ে চলি। সামনে উঁচু থাকতে পারে, খানাখন্দ থাকতে পারে। কিন্তু এক অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে শান্ত দৌড়োচ্ছে। ঘুরঘুট্টি আঁধারে এভাবে দৌড়োনো যায় চূড়ান্ত অধৈর্য আর পাগলপারা হলে। কেন দৌড়োচ্ছে? কোথা থেকে এক অসম্ভব সুন্দর মায়াবী পুরুষকণ্ঠ শান্তকে কী কী যেন বলছে। বাবার মতো গম্ভীর কিন্তু মায়ের মতো আকুল। বজ্রের ভরাট কিন্তু জ্যোছনার মতো নরম। গমগমে কিন্তু রিনরিনে। ওকেই কী যেন বলছে। কী বলছে তার দিকে খেয়াল নেই। শান্তর শুধু মনে হচ্ছে, এই কণ্ঠ যাঁর সেই মানুষটাকে না দেখতে পেলে শান্ত বুক ফেটে মরে যাবে। এক নজর হলেও, এক ঝলক হলেও দেখতেই হবে। অক্সিজেনশূন্যতার মতো বুক এঁটে আসে শান্তর। এক বার আমাকে দেখতেই হবে। আঁধারের পরোয়া নেই। মরে গেলে যাব। এক বার শুধু দেখতে দিন, কে আপনি। একটা বার। মরীচিকার মতো। এদিকে গেলে ওদিক থেকে আসে। ওদিক গেলে এদিক। কলিজা ছিঁড়ে যেন বেরিয়ে আসবে দেখতে না পেলে। বাঁচতে হলে দেখতেই হবে। এক নজর। প্লিজ।

না-ই বা যদি দিলে দেখা
কেন স্বপন ভাঙালে?
পিয়াস কেন জাগালে?
নিমেষ তরে মনের ঘরে
আলো কেন জ্বালালে?

ঐ আলোতে, মন ভুলোতে
পেলেম তো না-ই এক পলক
ক্ষণিক আলোর ঝলকানিতে
ঝলসে গেল পোড়ার চোখ।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। বুকচাপা কষ্টটা এতো বাস্তব! ভীষণ কষ্ট। এক নজর দেখতে পারলাম না। আহারে, এতো কাছে পেয়েও হারালাম। কানে এখনও সেই ভরাট কিন্তু জ্যোছনা কণ্ঠের স্বাদ। বুকের ভিতর অসীম শূন্যতার হাহাকার। ইস! পরের ক'দিন একদম এলোমেলো গেল শান্তর। কণ্ঠ শোনার আকুলতা আর ব্যর্থতার তিতে অনুভূতি জীবন্ত রইল ক'দিন। প্রতিরাতে চোখভরা আকুতি নিয়ে ঘুমোতে যায় ও। আরেকবার যদি আসেন উনি। তিনি আর আসেন না। কল্পনাও এতো জীবন্ত! আর বাস্তবও এতো অশরীরী! হতাশায় শান্তর পৃথিবী ছোটো হয়ে আসে।

মসজিদে শ্রীলঙ্কার এক জামাত এসেছিল সেবার। শান্ত একফাঁকে মওলানাকে জিগ্যেস না করে পারলোই না। খানিক থেমে শ্রীলঙ্কান মৌলভী গমগমে গলায় বলেছিল : 'শোনো বৎস! এই চোখে তাঁকে দেখতে পারা যাবে না। নজরের হিফাজত বাড়াও। বহু অবিশ্বাসী তাঁকে দেখে রাস্তা পায়, কতো গুনাহগার তাঁকে দেখে ফিরে আসে। কিন্তু তুমি দেখতে পাবে না। কারণ তুমি সব বোঝো। সব বুঝেও তুমি করো না। তোমার হিসেব আলাদা। এমনি এমনি পাওয়া তোমার নসিবে নেই।' আহ, পোড়াচোখ। তোর নাশ হোক। তোর জন্য আমি 'সব' হারালাম।

আজকে আবার ঐদিনকের মতো লাগছে শান্তর। স্বপ্ন আর বাস্তবতার সীমানায় কেউ রবার ডলে দিয়েছে। টেনশনের পাহাড়টা নেমে যেতেই এক অদ্ভুত ঘোর। পুরো দেহমন জুড়ে। এ স্বপ্নও না, বাস্তবও না। এ হলো ঘোরের জগৎ।

এ জগতে যার নিত্য বিচরণ, আপন গহনে যার বিচরণের ফুরসত, তার কী ভাগ্যি!। সে সময়টা সংসার আমাদের দেয় একদণ্ড? সকাল থেকে রাত, রাত গিয়ে সকাল। চলছি তো চলছিই। চোখ বুঁজে দেখুন। আপনার ভেতরে এক বিক্ষুব্ধ সাগর। উথালপাথাল। শোঁ শোঁ ঝড়ের শব্দ। বিকট শব্দে বাজ পড়লো কাছেই। পেয়েছেন সেই পাগলা সাগর? হাজারও সমস্যা, ব্যস্ততা, দায়িত্ব, পরিকল্পনার ঝড়ঝাপটা। এবার ডুব দেন। যেতে থাকেন, যেতে থাকেন, যেতে থাকেন। সাগরের একদম তলায় গিয়ে বসেন। দেখেন, এখানে কেনো ঢেউ নেই। সব স্থির, শান্ত। আলো নেই, শব্দ নেই। কেউ নেই। একটা মাত্র জানালা আছে। সেই জানালা দিয়ে অসীম এক সত্তার সাথে বাতচিত করা যায়। কাঁদা যায়, হাসা যায়। প্রাণ খুলে গল্প করা যায়। কষ্ট, স্বপ্ন, আশা, মুগ্ধতা সবকিছুতে মাখামাখি। পেয়েছেন? প্রতিদিন কিছু সময় এখানে গিয়ে হাজিরা দেয়া জরুরি। মালিকের কাছে দাসের হাজিরা। নামাযগুলো পড়া দরকার ছিলো এখানে গিয়ে। হয় না। কাজের কাজগুলো আমাদের কেন জানি হতে চায় না।

বাচ্চা দুটো ওয়েটিং রুম জুড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওদের ফ্লাইট এখনও আড়াই ঘণ্টা পর। পয়লা বিদেশযাত্রা। তার ওপর কাচ্চাবাচ্চাসমেত। কখন কী জটিলতা হয়। তাই আগেভাগেই গিয়ে বসে থাকা ভালো। বেশি রাতের ঢাকায় ভরসা নেই।

'চলো খাদীজা, প্লেন দেখে আসি।'

'চলো বাবা। কোথায়?'

'ঐ দেখো, কত্ত বড়ো প্লেন। কাঁচের ভেতর দিয়ে একটু বামে তাকাও।'

'হমমম। অনেএএএক বড়। এইটা আকাশে উড়বে? কীভাবে উড়বে? অনেক ভারী তো। আমরা তো পড়ে যাবো। কোথায় পড়ে যাবো? পড়ে গেলে কী হবে?'

কলসি ফুটো হয়ে গেলে যা হয় আরকি। ফুটো কলসের পানি যোগান দিতে দিতে কেটে গেল ওয়েটিং রুমের বাকি সময়টুকু।

রাত একটার ঢাকা। এই শহর নিয়ে আমাদের অভিযোগ-অনুযোগ-ঘ্যানঘ্যানানির শেষ নেই। এই শহরে মানুষ থাকে? জ্যাম, ধুলো, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, আবর্জনা, দুর্গন্ধ। নিয়মকানুন নেই। এই বাসগুলো রাস্তার মাঝে এলোপাথাড়ি যাত্রী উঠাচ্ছে। লেগুনাগুলো রাস্তাই ব্লক করে দিয়েছে। রিকশাগুলো ডানে বাঁয়ে দেয় ঢুকিয়ে। বাইকগুলো বাজিয়ে যাচ্ছে হর্ন, যেন উন্মাদ একেকটা। একটু বৃষ্টিতেই হাঁটুপানি। কিন্তু রাত একটার ঢাকা অন্যরকম। সোডিয়ামের হলদে আলোয় এক জনমদুখী শহর। অসুস্থ মায়ের মতো। রুগি, কাহিল, ঘেয়ো, অচল, পরনির্ভর মা। কিন্তু নিজেরই তো মা। সারাদিন বকি। আর রাত একটায় সোডিয়াম বাতিতে মায়ের ঘুমন্ত মুখখানি ধিক্কার দিয়ে ওঠে। আজ ছেড়ে যাবার কালে হঠাৎ আপন হয়ে এলো হতচ্ছাড়ী শহরটা।

প্লেনে উঠে সেট হয়ে বসেছে ওরা। সাথে শান্তর স্ত্রী আর দুই বাচ্চা। সিট পড়েছে বউবাচ্চা থেকে দূরে একখানে। অনেকেই স্ত্রীর সাথে, মায়ের সাথে বসার জন্য নিজেদের মাঝে সিট বদলে নিচ্ছে। বিমানবালারাই হেল্প করছে অদলবদলে। এক বাঙালি যাত্রীকে একটু রিকুয়েস্ট করেছিলো শান্ত সিটটা একটু চেঞ্জ করার জন্য, যাতে পরিবারের সাথে বসতে পারে। মশাই অম্লানবদনে জানালেন : 'বসে পড়েছি ভাই।' সিটবদলের এই হিড়িকের মাঝে স্বদেশি ভায়ের কাছে 'বসে পড়েছি ভাই' শুনে শান্তর মনটা তিতে হয়ে উঠল। দ্বিতীয় বার অনুরোধ করতে গায় বাধলো বড়। বিদেশ-বিভুঁইয়ে আপনার সবচে বড় উপকার করবে আপনার দেশের লোক, আবার সবচে বড় ক্ষতিটাও আসবে আপনার দেশি ভায়ের কাছ থেকেই। সহযোগিতাও পাবেন, চূড়ান্ত অসহযোগিতাও পাবেন। যেখানে যাচ্ছে ওরা, সেখানে যেতে নাকি এমন বহু অপছন্দনীয় ঘটনা ঘটে, সব খুশিমনে সয়ে নিতে হয়। মনের কষ্ট, শরীরের কষ্ট এসব হওয়া নাকি ভালো। সবারই নাকি টুকটাক হয়টয়।

প্রচণ্ড গতিতে প্লেন ছুটছে রানওয়েতে। ঝাঁকুনি দিয়ে জমিন ছাড়ার সাথে সাথে সব স্থির। গতি আর টের পাওয়া যায় না। মেঘের ভিতর দিয়ে যাবার সময়

অবশ্য সামান্য ঝাঁকিটাকি দেয়। বড় বিমানে তাও বোঝা যায় না। জীবনে প্রথম প্লেনে চড়েছিল শান্ত কক্সবাজার-টু-ঢাকা। সে এক ভয়ানক ব্যাপারস্যাপার। সেবার তওবা হয়েছিল এক্কেবারে খাঁটি। নির্ভেজাল। 'আয় আল্লাহ! এক বার শুধু ভালোয় ভালোয় নামিয়ে দে মালিক। জীবনে যদি আর কোনো গুনাহ করেছি তো বাপের দেয়া নাম বদলে রাখবো।' ভয় পাবে না কেন বলেন? রানওয়েতে যে স্পীডে প্লেন চলে, আর টেক অফ করার সময়টার যে ঝাঁকুনিটা... আবার ধরেন কথা নেই বার্তা নেই, ওদিকে এক বারখুরদার মাইকে রসিয়ে রসিয়ে বলছে : 'সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, আপনারা এখন ৩৩ হাজার ফুট ওপর দিয়ে যাচ্ছেন।' আরে, ছেলেখেলা নাকি? পড়ে গেলে কী হবে এখন? পয়লা বিমানে ওঠার অনুভূতি মোটেই সুখকর না। বিভীষিকাময় পরিস্থিতি মশাই।

আসলেই আমি প্লেনে? নাকি নিজের বিছানায় ঘুমাচ্ছি। নাহ, ঠিকই তো আছে। প্লেনেই তো। আসলেই, আমি যাচ্ছি? এ আমি কোথায় যাচ্ছি? না ছিলো ছুটির আশা, না ছিলো টাকার সংস্থান। মাত্র ১৪ দিনের মাথায় কোত্থেকে কোত্থেকে সব হয়ে গেল? এতোগুলা টাকা। ছুটি হবে না নিশ্চিত। ফিরেও যেতে হতে পারতো ইমিগ্রেশন থেকে। হায় হায়। এখানে যেতে হলে তো দিনের পর দিন চোখের পানি ফেলতে হয়। জায়নামাযে দু'হাত তুলে কতো কাকুতিমিনতি করে এখানে যাবার ভিসা মেলে। তত করে চেয়েছে বলে তো মনে হয় না শান্তর। তবে কেন এই আচমকা ডাক? ১৪ দিনের নোটিশে কেন জরুরি তলব? প্রিয়দের তো ডাকা হয় সম্মানিত করতে; আমার মতো ফেরারি আসামিকে কেন এই সমন জারি? ফিরে এলো শান্তর সেই দুরুদুরু ভাবটা। তবে এবার একচিমটি সুখের সাথে মিশে। তাহলে আমি আসলেই যাচ্ছি।

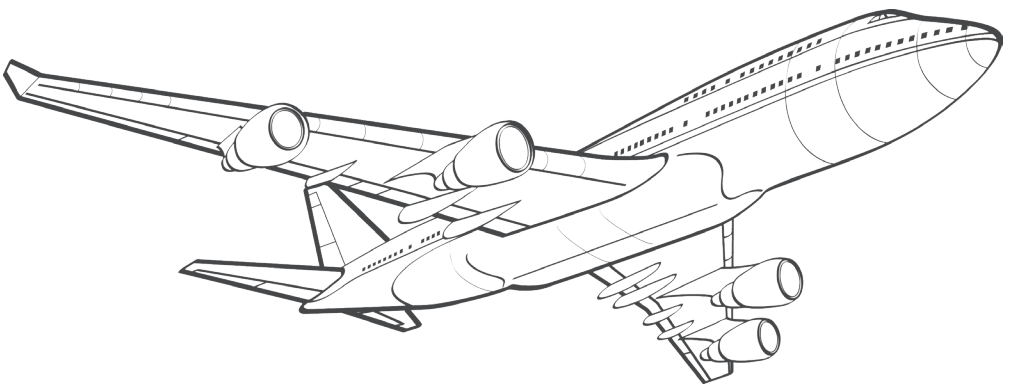

অবশেষে প্রিয়তমের শহরে যাচ্ছি। যেখানে প্রিয়রা যায়। যেখান থেকে শুদ্ধরা ফিরে আসে। যেখানে পাগলরা যায়। গিয়ে ফেরত আসে দ্বিগুণ পাগল হয়ে। প্লেনের সিটের সামনে ছোটো একটা স্ক্রীন। সেখানে সফরের গতিপথ দেখা যাচ্ছে। অপলক চেয়ে রইল শান্ত। সেকেন্ডে সেকেন্ডে কমছে দূরত্ব। আমি অবশেষে যেতে পারছি? সত্যিই কবুল হয়েছি, মালিক? ৫০০০ কিলো দেখাচ্ছে। শহরের নাম? শহরের নাম মক্কা। দেড় বিলিয়ন প্রাণের কেবলা মক্কা। জগৎ-জাহানের স্রষ্টার প্রথম ইবাদতগাহ। সেই ইজ্জতওয়ালা রব্বের ইজ্জতদার ঘর। আর কী বলে পরিচয় দেবো? শব্দেরও তো একটা শেষ আছে, না?

দেড় বিলিয়ন পরান বন্দি এখানে। উড়ে বেড়ায় এখানকার বাতাসে। আছাড়িপিছাড়ি করে অলিতে গলিতে। কাঁদে হাসে। দেখার জিনিসগুলোই চোখ দেখতে পায় না। দেখবে যত্তোসব সর্বনেশে অখাদ্য। দেখবে যত নশ্বর, ছলনাময়, ধোঁকাবাজদের। দেখবে শুধু গাড়ি, বাড়ি, নারী, কাঁড়ি কাঁড়ি কড়ি। ওগুলোর দিকেই মন টানে। কিচ্ছু আমার না। রোজাদার যেমন ইফতারের আগে ভাবে পুরো দুনিয়া খেয়ে ফেলবে। আযানের পর এক গেলাস পানি খেলে পেট টইটম্বুর। দুনিয়াও অমনি। যেন সব আমার চাই। খেতে পারে অল্প, ডায়বেটিস-প্রেশার। ডাক্তার বলেছে শক্ত বিছনেয় শুতে। বউও একপিসই। টাকা তো আর চিবিয়ে খাওয়া চলে না। দুই গাড়িতে পা দেয়াও সম্ভব না। কী জীবন। তবুও সব চাই।

নাস্তা শেষে খানিক চোখ লেগে এসেছিল। রাতজাগা চোখ। বাহরাইনে ট্রানজিট আছে আড়াই ঘণ্টা। বাহরাইন থেকে জেদ্দা আরও দুই ঘণ্টা। এখন ঘুমিয়ে না নিলে কপালে দুঃখ আছে। ঘুম আর জেগে থাকার ভিতরে অবশ্য এখন আর পার্থক্য নেই। ঘোরের জগতে সব এক। বাস্তবই যেখানে স্বপ্নের মতো। ঘুমও যেন স্বপ্নের ভিতরে ঘুম। পুরোটাই স্বপ্ন। এর ভেতর জাগাই কী, আর ঘুমই কী।

বাহরাইন এয়ারপোর্ট। কতো দেশের মানুষ। কতো রঙের মানুষ। কতো গড়নের। কতো ধরনের। বিদেশভ্রমণ মানুষের বিচারবুদ্ধি বাড়ায়। আল্লাহর সৃষ্টির কারিশমা অনুভব করা শেখায়। দেশে তো দেখেন একই ধরনের মানুষ। একই ধরনের ল্যান্ডস্কেপ। একই ধরনের জীবনযাত্রা। দেশ থেকে বাইরে পা ফেললেই রকমারি দুনিয়া, রকমারি মানুষ। সেই খালিক কতো নিপুণ, কতো বড় শিল্পী, কতো বড় কারিগর। কতো ডিজাইন তাঁর কাছে, গঠনের কতো ধরন তাঁর ইলমে। কতো রূপ তাঁর কারিগরিতে। দুনিয়া এতো বৈচিত্র্য দিয়ে সাজানো। জান্নাত তাহলে

কেমন? ঐ জান্নাতের জন্যই তো প্রতিযোগিতা মানায়।

বাংলাদেশে ইমিগ্রেশনের পরেই পানিটানি জাতীয় জিনিস আটকে দিয়েছে। আর নিতে দেয়নি। ওদিকে তেষ্টা পেয়েছে ভয়াবহ। ট্রানজিটে এটা-ওটা খরিদ করার জরুরত হতে পারে। এজন্য রিয়ালের সাথে সামান্য কিছু ডলারও রেখেছে শান্ত। ছোটো ছেলেটাকে সেরেলাক খাওয়ানোর জন্য গরম পানি দরকার। কী করি কী করি। এয়ারপোর্টে এন্তার কফিশপটপ। স্বর্ণের দামের কাছাকাছি। কফি যেহেতু খাচ্ছি না, মাগনা মাগনা পানি চাবো? দেবে? সংকোচ মাড়িয়ে এক কফিশপে ঢুকে শান্ত গরম পানি চাইলো। ফিলিপিনো মাঝবয়েসি মহিলা। বাচ্চা খাবে শুনে ঢেলে দিলো কফির পানি। মায়ের জাত। হয়তো দেশে রেখে এসেছে টুকরো টুকরো কলিজা। রেখে এসেছে নারীর জীবন।

'পয়সা কতো?'

'লাগবে না। অমনি নাও।'

একেবারে কিছু না কিনলে কেমন হয়। 'বোতলের নর্মাল পানি কতো?'

'৮ ডলার।'

সেরেছে। হাফ লিটার পানির দাম ৮৮৮ টাকা? শুনেই পিপাসা মিটে গেল। থাক বাপু, লজ্জাশরম করে লাভ নেই। ও পানিতে গলা ভিজবে না। পুড়তে পুড়তে নামবে। পরে অবশ্যি ফ্রি পানি মিলেছিল ওয়াশরুমের পাশেই। তাতেই রক্ষে।

এয়ারপোর্ট করিডোরে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে দুই শ্বেতাঙ্গ তরুণী। চোখে সানগ্লাস সেঁটে। শান্তর আড়াই বছরের ছেলেটা টুইটুই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর-ওর কাছে গিয়ে আদর-টাদর নিচ্ছে। হঠাৎ মেয়েটা তড়াক করে উঠে বসলো। হামযার হাতে ওর সানগ্লাসটা। আর বলছে 'চ-তে চশমা... সুন্দল চশমা'। আশপাশের মানুষও হেসে উঠলো। মুচকি হেসে গালটা টেনে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে গেল বিদেশিনি। পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীর শিশুকে চেহারায় আশ্চর্য মায়া দিয়ে পাঠানো হয়। যেন ওরা কারও না কারও মায়ায় টিকে যায়। এই মায়াই ওদের সারভাইভাল টেকনিক। কেউ না কেউ মায়ায় জড়িয়ে তার দায়িত্ব নিয়ে নেয়। এমনই এক এতীম বাপ-মা-হারা শিশুর দায়িত্ব নিয়েছিল এক চাচা। দুনিয়াভরা মায়া তাঁর মুখশ্রী জুড়ে। নিজের সন্তানের চেয়ে বেশি মমতা দিয়ে পালা হতো তাঁকে। এক মুহূর্ত আবডাল হলে চাচা-চাচীর পরান টেকা দায়। দুই বছরের নবিজি কেমন ছিলেন? টুকটুক করে হাঁটতেন। মা আমিনা কলিজার সাথে চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠতেন স্বামীশোকে,

স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে। দাদা মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকতেন চন্দ্রকলার মতো নাতির বড় হওয়ার দিকে। এ শিশু কি সাধারণ কোনো শিশু? এক মুহূর্ত কাছছাড়া করতেন না দাদা। নিয়ে বেড়াতেন সাথে করে। হালিমা টের পেয়েছিল, কী নিয়ে এসেছে ঘরে, কাকে নিয়ে এসেছে ঘরে। যে চিনেছে সে বর্তে গেছে। সে দুনিয়াতেও জিতেছে, মরেও জিতেছে। চেনেনি কেবল অভাগারা। সেই এতীম শিশুর মায়ায় মাতোয়ারা দোজাহান। শত কোটি মানুষ পরানবন্দি সে মায়ায়।

সাথে উমরার একটা গ্রুপও যাচ্ছে। বাহরাইন এয়ারপোর্টে সবাই ইহরাম পরে ফেলেছে ততক্ষণে। মীকাত ক্রস করার সময় ওরা থাকবে আকাশে। মীকাত হলো হজ-উমরাকারীর জন্য ইহরাম বাঁধার সীমানা। এই সীমানার বাইরে থেকে ইহরাম বেঁধে ঢুকতে হয়। ইহরাম বাঁধা মানে হলো পুরুষের ক্ষেত্রে ইহরামের দুই টুকরো সেলাইছাড়া কাপড় পরা, হজ-উমরার নিয়ত করা আর তালবিয়া পড়া শুরু করা (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক)। হজ-উমরাকারী মীকাতের সীমানার বাইরে থেকে ইহরাম

বাঁধতে না পারলে, যদি এই সীমার ভিতরে গিয়ে ইহরাম বেঁধে হজ-উমরা করে, তবে দম ওয়াজিব হবে (পশু কুরবানি)। অথবা হজ-উমরার আগে আগে আবার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসতে হবে। উমরার গ্রুপগুলো এখন ইহরামের পোশাক পরে নিলো, মীকাত ক্রস করার সময় প্লেনে ঘোষণা হবে, তখন জাস্ট নিয়তটা করে ফেলবে। বা অনেকে অলরেডি করেও ফেলেছে। আশপাশে গুনগুন : লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।

'হাজির, আল্লাহ আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আর নিয়ামত তোমার জন্য... আর সমস্ত রাজত্বও তোমার জন্য।' তোমার রাজত্বে কেন আমরা কষ্টে আছি, মালিক? আমরা কি তোমার নই? তুমি কি আমাদের নও? তাহলে কেন, মালিক? কেন? আমাদের সম্মিলিত গুনাহের কি কোনো মাফ নেই?

শান্তর মনে অন্য ধান্ধা। জেদ্দা থেকে আগে যাবে মদীনা। মদীনাওয়ালার নকল করে যুলহুলাইফা থেকে ইহরাম বেঁধে আসবে। মদীনাওয়ালার নকল করে এসে মালিকের দরবারে উবু হয়ে পড়বে। মদীনাওয়ালার কদমে কদম, রঙে রঙ, সাজে সাজ।

শূন্য ঝুলি, শূন্য তরী, অবাধ্যতায় সন্ধ্যা করি'
ভিড়েছি তোর বন্দরে
থরথর অন্তরে
কী দিয়ে তোর মন মানাবো, কী দেখিয়ে রাগ ভাঙাবো
অনেক ভেবে, আর কী হবে? এলাম ফিরে ঘাট 'পরে।
তোর প্রিয়, তার বেশ ধরে,
করুণাতটে জোয়ার ওঠে আজ যদি এই মন্তরে।

ভালোবাসার রাস্তা

ছোট একটা প্লেন ওদেরকে বাহরাইন থেকে নামিয়ে দিয়ে গেল। জেদ্দা। লোহিত সাগরের পাড়ে টিপটপ শহর। স্কাইলাইন ক্লিয়ার। হাইরাইজ ভবন খুব কম। এপার্টমেন্ট কিছু আছে, তা ঢাকার তুলনায় না থাকার মতোই। ৩-৪ তলা বিল্ডিংই বেশি। গরম বেশি বলে ছোটো ছোটো জানালা। গরমের মওসুমে ৫০ ডিগ্রি খুব স্বাভাবিক তাপমাত্রা। আমাদের দেশে যেখানে ৪০ উঠলেই প্রাণ আইঢাই। জানালার পাশে পাশে এসি। সব বিল্ডিংয়ের বাইরের সার্ফেস মার্বেলের টাইলস। যাতে ঘরের ভিতর গরম কম যায়। রঙবেরঙের বিল্ডিং না। ক্রিম কালারেরই নানান সাদাটে শেড। কোনোটা গাঢ়, কোনোটা হালকা। এই কালারটা বোধ হয় হিট প্রতিফলন করে ভালো।

সামান্য জ্যাম হয় মাঝেসাঝে। তবে রাস্তাগুলো খুব গবেষণা করে বানানো। ঝকঝকে। একবার রাস্তা মিস করলে অনেক দূর গিয়ে ঘুরে আসতে হয়। জমির অভাব নেই, টাকার অভাব নেই। ইচ্ছেমতো বানিয়েছে। ফুটপাতের মানুষ হাতে গোনা যাবে। ট্রাফিক আইন না মানার কোনো সুযোগ নেই। খানিক পরে পরে ক্যামেরা। পুরো গাড়ি স্ক্যান হয়ে যায়। সিটবেল্ট না পড়লে সাঁই করে পথ আটকাবে পুলিশের গাড়ি, জরিমানা হাঁকবে ৫০০ রিয়াল।

শান্তর শ্বশুর-শাশুড়ি ৪০ বছর ধরে জেদ্দাপ্রবাসী। কুড়িটা বছর এই জল-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা বেলি-ঝোপটা উপড়ে নিয়ে নিজের বাসায় লাগিয়েছে শান্ত। এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে এসেছেন শ্বশুরসাহেব আর বড় ভায়রা। তুমি শ্বশুরের

মেহমান না, শান্ত। তুমি আল্লাহর মেহমান, রাসূলের মেহমান। 'জামাই-আদর' পেতে আসোনি, শাশুড়ির রান্না খেতে আসোনি। মাইন্ড ইট!

প্রায় ২০ ঘণ্টা ঘুম নেই ওর। খেতে বসে ঘুমিয়েই যাচ্ছিল। পরের দিনটাও গেল ঘুমিয়ে ঝিমিয়ে। ৩ ঘণ্টা সামনে এগিয়ে এসেছে। দিনরাতের রুটিনই উলটেপালটে গেছে।

বিকেল গড়াচ্ছে। লোহিত সাগরের তীর ঘেঁষে মার্বেল পাথরের পার্ক। দূরে সৌদি বাদশাহর প্রমোদভবন নজরে এলো। ঝকঝকে নীল পানি। বেশ বড় বড় ঢেউ। ঠান্ডা স্বাস্থ্যকর হাওয়া। হাঁটার যে একটা মজা আছে, তা ঢাকায় থেকে বোঝা দুষ্কর। রাস্তায় কোনো হর্ন নেই, লিটারেলি জিরো হর্ন। ধুলা নেই, ধোঁয়া নেই। ভিড় নেই, রিকশা-বাইক ঢুকিয়ে দেয় না নাক। একটু পর পর থেমে যেতে হয় না ভিড়ের চোটে। নজরের হেফাজতে ব্যতিব্যস্ত হতে হয় না। নেই নারীদেহের বিলবোর্ড। সারাদিন হাঁটা যায়। হাঁটতে ইচ্ছে করে। এখানে থেকে যারা অভ্যস্ত, তাদের জন্য দেশে ফিরে এডজাস্ট করা কঠিন। সমস্যা হলো, সৌদিরা বাইরের কাউকে নাগরিকত্ব দেয় না। ইকামা নামে বছরওয়ারি ভিসা ইস্যু করে। রিনিউ করে করে থাকতে হয়। চাইলে আমেরিকার মতো ডিভি লটারি দিতে পারতো। মুসলিম দেশগুলো থেকে টেক-এক্সপার্ট, গবেষকদের রেখে দিতে পারতো। ইউরোপ যেভাবে মেধাপাচার করছে, সেভাবে করতে পারতো। দেশও উন্নত হতো, মুসলিম মেধাগুলোও মুসলিমদের হাতে থাকতো। চাইলে... থাক, ওসব বলে আর কী হবে। চকচকে এই দেশে মুসলিম বিশ্বের জুলুম-নির্যাতন-কষ্টরা ঢোকার সাহস পায় না।

কী হবে আর গেয়ে পুরোনো সে গান?
কী হবে আর বিচার দিয়ে?
করে অভিমান?
কালের আয়নায়
অভিযোগ যত
সব ফিরে ফিরে চায়
আমারই নালিশ শত
অট্টহাসির উপহাসে
... অক্ষমতায়।

জেদ্দা বহুজাতিক শহর। কসমোপলিটান। বহু পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশি, ফিলিপিনো, আফ্রিকান এখানে চাকরি করে। আর পশ্চিমারা করে ব্যবসা। এমন কোনো ইউরোপীয় ব্র্যান্ড নেই যাদের এখানে দশ কাঠার ওপর দ্বিতল-ত্রিতল শোরুম নেই। যেসবের নাম আমরা বাংলাদেশে জীবনেও শুনিনি। আমাদের মতো গরিব গরিব দেশে ব্যবসাই হয় না এদের। সৌদিদের ভোগের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে এরা। বাস কোম্পানি সব ইউরোপীয়। বিলাসবহুল সব শপিং মল। পশ্চিমা কাটিং-এর পোশাকআশাক। কেনে বলেই রেখেছে নিশ্চয়। এক সিনেমা হলের সামনে দিয়ে ঘুরে এলো ওরা দুই ভায়রা। দেখে বিষিয়ে ওঠল মন। পুরোনো শহর ভেঙে ফেলা হচ্ছে, নতুন সব প্রজেক্ট। শহরের একটা ওয়ার্ড চীনাদের দেয়া হয়েছে। দোকানে-অফিসে ক্যাশে সৌদি মেয়েরা চাকরি করছে। নতুন পলিসি। একজন সৌদি পুরুষের এগেইনস্টে ৪ জন অনারবকে নিয়োগ দেয়া যাবে। আর একজন সৌদি মেয়ে নিলে ৮ জন অনারব আনা যাবে। অনারবের বেতন দিতে হয় কম কম; যত বেশি রাখা যায়, তত লাভ মালিকের। তাই ছোটোবড় সব কোম্পানি-মল এখন দেদারসে নিয়োগ দিচ্ছে সৌদি মেয়েদের।

'ভাই, বামে এই বড় বড় এপার্টমেন্টগুলো কীসের?' খানবিশেক বিশতলা ভবন একসাথে।

'ও এগুলো? সরকার প্রজেক্ট নিয়েছিল গ্রাম্য সৌদিদেরকে শহুরে জীবনে অভ্যস্ত করার। কাজ হয়নি। ওরা গ্রামেই থাকবে। এখন এসব ফাঁকা পড়ে আছে।' জেদ্দায় সাহাবিদের বংশধরদের ভোগবাদী জীবন দেখে শান্তর মনটা মেঘলা হয়ে আসে। গ্রামীণ সাদাসিধে সৌদি দেখতে হবে। নইলে এ তিতে সারবে না।

'ভাই, সৌদি স্থানীয়রা এমবিএস-এর ওপর খুশি?'

'আগে এই বংশের ওপর খুশিই ছিলো সবাই। কারণ সবাই লাভে ছিল। বাইরের লোক এসে ব্যবসা করতে চাইলে কফিল হিসেবে এরা লাভ পেতোটেতো। এই বছর সব পণ্যে ভ্যাট যুক্ত করেছে। কফিল হবার ওপর বিধিনিষেধ দিয়েছে। নানা আইনকানুন করেছে। এখন কিছুটা নাখোশ।'

বিয়ের সাত বছর পর শান্তর বউ এসেছে মায়ের কাছে। ধানগাছটা ফিরেছে বীজতলায়। খাদীজা এই প্রথম এসেছে নানাবাড়ি। খুশিতে তাকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে নানী-খালারা প্রথম বারের মতো ছুঁয়ে আদর করতে পারছে হামযাকে। পুরো ঘরদোর খুশিতে ঝলমল করছে। শান্ত ঝলমল করতে পারছে না। ১৪ দিনের মধ্যে একটা দিন চলে গেল শান্তর। আর মাত্র ১৩ দিন হাতে। আর

না। বউবাচ্চা শ্বশুরবাড়িতে ফেলে দিয়ে শান্ত সে রাতেই মেলা করলো। আর এক মুহূর্ত এখানে না। এখানে আরাম করার জন্য তো আসোনি ভাই। মরার ঘুমেই সব খেলো। এইবেলা ভাগো, বাকি সময়টা গিয়ে থাকো তাঁর কাছে। যতক্ষণ সম্ভব, যতবেশি সময় ধরে সম্ভব। প্রিয়সঙ্গ থেকে এক সেকেন্ডও এদিক-সেদিক যেন না হারায়।

তাঁর কাছে দু'দণ্ড থাকবো বলে
পালিয়েছি সারা দুনিয়াকে না-বলে

এতটুকু অনুভবে
ফের মিছে আশা কলরবে
পৃথিবী, চেয়ো না ভাগ
  এইটুকু সময় মাঝে
তোমার জীবন তুমি
        নিয়ে চলে যাও
        আমারে ছেড়ে যাও
  মোর বিরহের কাছে।

কেরালার মুসলিমরা ধুন্ধুমার ব্যবসা করছে সৌদিতে। বংশপরম্পরায় ১৪০০ বছর ধরেই ওদের ব্যবসার রিশতা হেজাযে। আরব-দাক্ষিণাত্য বাণিজ্যপথে। জেদ্দায় বিশাল শপিং মলটল, হজ-উমরা সার্ভিস ওদের। তেমনই এক জেদ্দা-মদীনা বাস সার্ভিসে উঠে পড়লো শান্ত। রাত দশটা। শেষ সিটটা মিললো কোনোমতে। মদীনায় নাকি বেশ শীত। ভালোই শীত। টের পাওয়া গেল যাত্রাবিরতি হোটেলটায়। মরুর আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন। দিনে রোদের হিট বেশি, রাতে শীতের কাঁপুনি বেশি।

রাত কেটে ছুটে চলেছে বাস। নাহ, আর কোনো তাড়া নেই, সময়ের হিসেব নেই। সময় গোনার দরকার নেই, কোনো প্রতীক্ষা নেই। প্রেমের পথেই তো আছি, তাড়া কীসের? মাঝে মাঝে কেবল সন্দেহরা এসে দোলা দিয়ে চলে যায় : আসলেই আমি যাচ্ছি তো উনার কাছে? আমার মতো পাপী কেন ডাক পেলো? কেন? সেই সন্দেহের মাঝেও অবশ্যি সুখের ছটা। এ যদি স্বপ্নও হয়, দুঃখ নেই। স্বপ্ন হয় হোক, স্বপ্নই চলুক। এমন স্বপ্নই ক'জনের নসিবে জোটে। এই স্বপ্ন আর না ভাঙুক।

ঝিমুনিটা কেটে গেল বাস থামতেই। এসে পড়েছি? এতো তাড়াতাড়ি? রাত

৩টা। বাস এসেছে ১২০-১৪০ কিলো বেগে। ৪৫০ কিলো চলে এসেছে মাত্র ৪ ঘণ্টায়। হিন্দিতে গাইড বলে ওঠলো : 'আমরা মসজিদে কুবায়। সবাই নেমে ফ্রেশ হয়ে দু'রাকাত নফল পড়ে নিন। এখানে দু'রাকাত নফল পড়া উমরার সমান সওয়াব।' আরে বলে কী? মসজিদে কুবা? এই সেই মসজিদে কুবা? রাতের ক্যানভাসে সাদা গম্বুজ-মিনার যেন মুচকি হেসে বলছে : হ্যাঁ গো, আমিই। এই যে দেখছো বড় গম্বুজটার সিলিঙে দুইটা ডট, এটাই সেই জায়গা যেখানে প্রিয়নবির উট বসেছিল। যুগ যুগ ধরে আগলে রাখা হয়েছে এই স্মৃতিচিহ্ন।

মদীনার থেকে মাইল তিনেক দূরে বা অদূরে কুবা গ্রাম। মাসখানেক ধরেই মক্কা থেকে দলে দলে লোকে আসছে এ পানে। তাদের মধ্যে বড় অংশটাই চলে যাচ্ছে ইয়াসরিব শহরে। কেউ কেউ গ্রামেও রয়ে গেছে। বনি আমরের মহল্লায় মজলিস বসে রোজ এশার পর। মুহাজিরদের মুখে মক্কার নির্যাতনের গল্প শোনে সবাই। তন্ময় হয়ে। ছলছল চোখে। মজলিস ভাঙে শতশত বুক উদ্বিগ্নতা নিয়ে। এক রাশ অস্বস্তি আর পেরেশানি নিয়ে শুতে যায় পুরো মহল্লা। প্রাণের নবিই যে এখনও শত্রুর মাঝখানে। এতো জুলুম-কষ্ট আর মৃত্যুভয়ের মাঝে। হঠাৎ একদিন মুখে মুখে চাউর হলো : নবিজি মক্কা থেকে নিখোঁজ। তাঁকে ধরতে একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে মক্কা।

সেদিন থেকে বনি আমরের চোখে ঘুম নেই। রোজ ফজরের নামায শেষে কুবাবাসী তরুবীথি থেকে মরু-প্রান্তরে বেরিয়ে আসে। ছেলে-বুড়ো সব। মহিলারাও কেউ কেউ। সূর্য যখন আগুনে হয়ে যায়, মাথার তালু গরমে চিড়বিড় করে ওঠে, তখন ফিরে আসে আর না পারতে। কবে আসবেন উনি? এই বুঝি এলেন, কাল নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। এতো দিনে তো এসে পড়ার কথা। রাস্তায় কোনো বিপদ-আপদ... ৪৫০ কিলো রাস্তা, যে-সে ব্যাপার তো না। মরুতে পথ হারানোর ভয়, ডাকাতের ভয়, মুশরিকদের হাতে গ্রেপ্তার হবার ভয়। ইহুদিরাও জানে এরা দৈনিক সক্কাল সক্কাল কোথায় যায়। হাজারও শঙ্কা-উদ্বেগ নিয়ে কুবায় রাতেরা নামে, হাজারও আশা-স্বপ্ন নিয়ে আসে সকালেরা।

আজও এসেছিল সবাই। রোদ তেতে উঠতেই একে একে সবাই ফিরে গেছে যার যার কাজে। চড়ে ওঠলো রোদ। হঠাৎ ছাদের ওপর থেকে ইহুদির চিৎকার : 'কাইলার ব্যাটারা, তিনি এসে গেছেন। তিনি এসে পড়েছেন।' আনন্দে ভেসে যাচ্ছে গাঁও। নবিজি এসে গেছেন। পড়িমরি করে ঘরদোর থেকে বেরিয়ে আসছে

মানুষ। খুশিতে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছে বুড়োরা, হুল্লোড় করতে করতে শিশুরা, উচ্ছ্বাসে চপলতায় নারীরা। এসেছেন, তিনি এসেছেন। লম্বা করে শ্বাস টেনে নেয় শান্ত। কুবার আকাশে-বাতাসে আজও মিশে আছে সে আনন্দ। নবিজির দর্শন পাবার প্রতীক্ষা। এই তো আর কিছুক্ষণ। আর কিছুক্ষণ পরেই প্রিয়তমের সাথে সাক্ষাৎ। আপনারা হয়ত শান্তর শরীরটাই দেখতে পাচ্ছেন। মনটা হুটোপুটি করছে কুবার গ্রামবাসীদের সাথে : এসে গেছেন। নবিজি এসে গেছেন। চলো, চলো। এই তো তিনি। একটু পরেই তিনি।

দূরত্বগুলো পরপর গাঁথে
সময়ের মশলায়
হাজার মাইল পুরু এক নিঃসঙ্গ দেয়ালের গায়
স্যাঁতসেঁতে অশ্রুতে শ্যাওলা-ধরা।

আজ সেই মহাক্ষণ
তোমার আমার মাঝে
আজকের পুণ্যসাঁঝে
কয়েকটি মাত্র অসহায় সময়
আর ক'টামাত্র দুর্বল মাইল।

বাস ওদেরকে নিয়ে গেল উহুদের প্রান্তরে। সেই উহুদ। ঐ তো শুয়ে আছেন হামযা রা., মুসআব বিন উমায়ের রা.-সহ কতো কতো সাহাবি। রাতে পাহাড়ের আকার ঠাহর করা গেল না। কবরও কারটা কোথায় লোকেট করা গেল না। যুদ্ধক্ষেত্রটাও বুঝা গেল না। মদীনার শীত, সূঁচের মতো। বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকে শান্ত : আমার চোখের সামনে সাহাবিরা? উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো? আল্লাহর রাজিখুশি সার্টিফিকেট পাওয়া শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো? নবিজিকে দেখেছেন, ছুঁয়েছেন, সেই মানুষগুলো এতো কাছে? তাঁদের দেশে আমি এখন? কল্পনা করেছি কোনোদিন?

আসসালামু আলাইকুম ইয়া আসহাবার রাসূল।

আসসালামু আলাইকুম ইয়া খাইরাল কুরুন।

আল্লাহ, আমাদেরকে হামযা রা.-এর নেতৃত্বে শহীদের কাতারে হাশর করুন। আবার দিনে দিনে আসতে হবে এক দফা।

বাস সার্ভিস ও হোটেল দুটোই কেরালার মুসলিমদের। ব্যবসার সম্পর্কে সরাসরি আরবদের হাত ধরে ইসলামের প্রবেশ এখানে, শাফেঈ মাযহাবের প্রসার। বিপরীতে উত্তর ভারত ও বাংলায় ইসলামের প্রচার হয়েছে তুর্কীয়-পাঠানদের হাতে, এসেছে হানাফি মাযহাব। ব্যবসা ছিলো মুসলমানের ইবাদত, ব্যবসা মুসলমানের দাওয়াহ, ব্যবসা মুসলমানের শক্তি। আজ ব্যবসাই আমাদের কাছে অস্পৃশ্য। ব্রিটিশরা শুধু চাকরি করতে শিখিয়ে গেছে আমাদের। দুনিয়ার ব্যবসা সব করবে ওরা। আর আমরা করবো ওদের চাকরি। বেলাল মসজিদের রাস্তাটার শেষ মাথায় হোটেলটা। মসজিদে নববি থেকে হাঁটাপথ ঠিক বারো মিনিট। একটা বিছানা বিশ রিয়াল। ফজরের আযানের বেশি বাকি নেই। সময় কাছিয়ে এসেছে।

পাশের বিছানায় এক ইন্দোনেশিয়ান মুয়াল্লিম। তার উমরা গ্রুপ আজকে আসবে প্লেনে, সেই খুশিতে সে আটখানা। ছবিটবি দেখাচ্ছে বের করে। শান্তকে বলল : তুমি তো আগে আসোনি। রেডি হও, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। হাবীবের দরবারে পয়লা হাজিরা। গোসল। নতুন জুব্বা-পাজামা। পাগড়ি, চাদর, আতর। কতো অপেক্ষার পর, কতো আকাঙ্ক্ষার পর, আজন্ম বিরহের পর। হায় হায়! কার কাছে যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি? কী বলবো গিয়ে? কোনমুখে যাচ্ছি?

দরবারে ইশক

ইন্দোনেশিয়ানের পিছে পিছে শান্ত। একটু পর পর তাড়া দিচ্ছে : 'পিছিয়ে পড়ছো কেন?' মনের অবস্থা তোমাকে কেমনে বলি, মালয়ী? এর কোনো ভাষা নেই। তোমার ইন্দো ভাষায় বললেও তুমি বুঝতে না। তুমি তো বহুবার এসেছো। এই প্রেমের দরিয়ায় আমি আনাড়ি সাঁতারু। এই পয়লা। ভয় হচ্ছে দরিয়ায় নাবতে। প্রতি স্টেপে শান্তর মনে হচ্ছে, কেন এলাম? কী জবাব দেবো গিয়ে? বরং ফিরে যাই। জমে আসে পাপী পা। থেমে আসে পাপী কলব। আবার ওদিকে কীসের এক দুর্নিবার আকর্ষণ কলজেয় দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতি কদমে ভয় আর খুশি। শ্রদ্ধা আর প্রেম। হতাশা আর উচ্ছ্বাস।

হঠাৎই রাতের ব্যাকগ্রাউন্ডে ভেসে ওঠে সবুজ গম্বুজ। চোখকেও সন্দেহ করা যায়? নাস্তিক হাঁদারা বলে : যা দেখি না, তা মানি না। আচ্ছা ভালো। যা দেখা যায়, তারও কি সব মানা যায়? দেখলেও কি বিশ্বাস হয় সবকিছু? আমি নিজেও কি বাস্তব? নাকি কল্পনা? এই গম্বুজ। কতোবার দেখেছে শান্ত ছবিতে, লাইভ টেলিকাস্টে হজের সময়, ইউটিউবে। কতদিন দুআ করেছে : নবির রওজায় না নিয়ে কবরে ডেকো না, মাবুদ। পিসিতে হোমস্ক্রীন সেট করেছে। মোবাইলে স্ক্রীনসেভার। আজ চর্মচক্ষুতে সেই দৃশ্য? পানিতে ঘোলা হয়ে আসে ভিজ্যুয়াল ফিল্ড। চোখ রগড়ে বড়... আরও বড় করে তাকায় শান্ত। ঠিক তো? ঐ গম্বুজটাই তো? নাকি প্রিয়দর্শন বিভ্রম? হ্যালুসিনেশন? অধিক শোকে মানুষ পাথর হয় শুনেছি। অধিক খুশিতেও হয়। অধিক রাগেও হয়। পাথর হওয়াটা বহুমুখী এক্সপ্রেশন। পাথরের শান্তর পাথরের মুখ অস্ফুটে আউড়ায় :